প্রাজ্ঞ

বার্ষিক পত্রিকা ২০২২-২৩

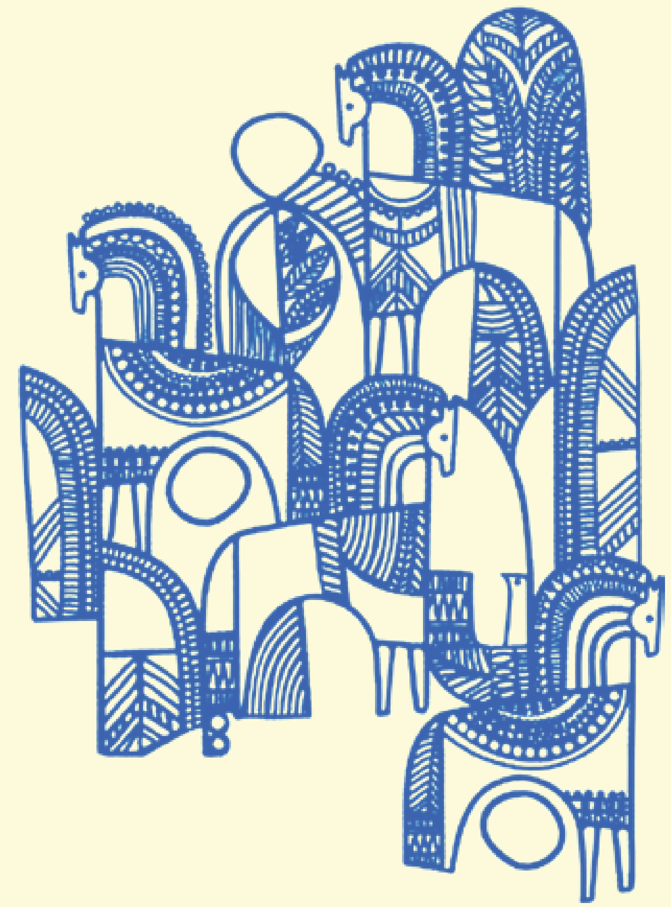

শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়

হাবড়া-প্রফুল্লনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন: ৭৪৩২৬৮

প্রাঙ্গ

বার্ষিক পত্রিকা, ২০২২-২৩

সার্বিক সহায়তা:

ড. সুব্রত চ্যাটার্জি, অধ্যক্ষ, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়

ড. পিয়ালি দে মৈত্র, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. মানবেন্দ্র শেখর ভদ্র, সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

সংকলন ও সম্পাদনা:

শ্রেয়শ্রী সাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

ড. সেবন্তী সাউ

সহকারী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

প্রকাশক:

শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়

হাবড়া-প্রফুল্লনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন: ৭৪৩২৬৮

বিষয় বিন্যাস

- মাননীয় অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা-বার্তা.. ৫
- মাননীয় উপাচার্যের শুভেচ্ছা-বার্তা.. ৭
- মাননীয় সভাপতির শুভেচ্ছা-বার্তা.. ৯
- ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—ড. মানবেন্দ্র শেখর ভদ্র ১১
- ইন্টারনেটের কবলে বই—রাজ রায়.. ১১
- রুদ্রাক্ষের শিব না শিবের রুদ্রাক্ষ—রোহিত ভট্টাচার্য.................................... ১২
- রবীন্দ্র কাব্যে জীবনদেবতা স্বরূপ—মৌ দাস মজুমদার.................................. ১৩
- The Past Form— Susmita Adhikary.. ১৭
- Shoe— Susmita Adhikary.. ১৭
- MAGIC— Shamindra Chattopadhyay.. ১৭
- কে ছিল ওটা?—শ্রেয়সী রায়.. ১৮
- নেতাজী—আয়ুষ ভট্টাচার্য.. ১৯
- স্বাধীনতা—আয়ুষ ভট্টাচার্য ১৯

প্রাণের বাংলা—রাজ রায়.. ১৯

- পরিপূরক আমরা সবাই—সংহিতা দেবনাথ.. ১৯
- ঋতুরাজ বসন্ত—রিমি দাস.. ২০
- যান্ত্রিকতার বাইরে—রিমি দাস.. ২০
- সবুজ ঘাসের মাঠের পাশে—রুমা পাল.. ২০
- বাংলা আমার মাতৃভাষা—জলি মিত্র.. ২১
- "গলদে বাংলা ভাষা"—জলি মিত্র.. ২১
- PIKU: MOTION SE HI EMOTION— Writadhi Chattopadhay............ ২২
- বাংলা ছোটগল্প: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কাল ও উত্তরকাল—রাইমা চন্দ................. ২৩
- আমার কলেজ জীবন—রুমা পাল.. ২৪

"প্রতিটি সূর্যাস্ত আশা এবং সম্ভাবনায় ভরা একটি নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে"

— কাজী নজরুল ইসলাম

Sree Chaitanya Mahavidyalaya
Formerly Sree Chaitanya College of Commerce
P.O. : Habra-Prafullanagar, North 24 Parganas, Pin - 743268

Ref. No. .... **Date :** ....

মাননীয় অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা বার্তা

দীর্ঘদিন পর শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব পত্রিকা 'প্রাঙ্গ' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশে এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি তাদের আন্তরিক শুভকামনা জানাই।

26.04.21
ড. সুব্রত চ্যাটার্জী
অধ্যক্ষ
শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়
Principal
Sree Chaitanya Mahavidyalaya
Habra, Prafullanagar
24 Parganas (N)

Phone : (Principal) 03216-237189, Helpline : 6291796572
E-mail : srchma@gmail.com Website : www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in

WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
Berunanpukuria, Malikapur Barasat,
24 Parganas (North), Kolkata - 700 126
Prof. Raj Kumar Kothari
Vice Chancellor
E-mail: vc@wbsu.ac.in / vc.wbsu@gmail.com

लक्ष्यं विश्वमानम्

Ref. No. WBSU / VC / Message / 324 /24 Date 16.04.2024

To,
The Principal,
Sree Chaitanya Mahavidyalaya,
Habra-Prafullanagar, North 24 Parganas,
PIN- 743268.

MESSAGE

I am very pleased to know that ***Sree Chaitanya Mahavidyalaya*** is going to publish the annual students' magazine ***Praanha*** for the year 2022-2023 showcasing the talent of creative writing of students, both current and passed out.

I convey my best wishes to all those who are promoting this endeavor.

Thanking you.

Vice Chancellor

West Bengal State University

Vice - Chancellor
West Bengal State University
Berunanpukuria, P.O.: Malikapur
Barasat, Kolkata- 700126

“অন্যায় করলে, পাপ করলে, অন্তরে যে পীড়া উপস্থিত হয়; মানুষের সেইটুকুই ভগবান। সেইটুকুই সত্য।”

—কাজী নজরুল ইসলাম

NARAYAN GOSWAMI
Member,
West Bengal Legislative Assembly

471

Present Address
161/50, Taki Road, Indraloke,
Kazipara, Barasat, Kolkata - 700124
Office Address
1/3, Power House,
Ashoknagar, North 24 Pgs., Pin-743222
Mob. 97326 97455 | Wh 91635 71600
Tel. 033 2584 6366

The Principal,

Sree Chaitanya Mahavidyalaya,

Habra-Prafullanagar, North 24 Parganas,

Pincode- 743268.

MESSAGE

I am very happy to know that ***Sree Chaitanya Mahavidyalaya*** is going to publish the annual students' magazine for the year 2022-2023.

The students' magazine namely ***Praanha*** contains original literary creations of students, both current and passed out.

I convey my heartfelt congratulations to all those who remained engaged in publishing this magazine.

My best wishes to this endeavor.

Thanking you

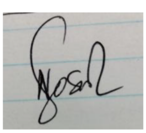

President

Sree Chaitanya Mahavidyalaya

“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার
নর।”

—কাজী নজরুল ইসলাম

ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ড. মানবেন্দ্র শেখর ভদ্র
বাণিজ্য বিভাগ, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ হওয়ার একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান।ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে খুব বেশি পিছনে না গেলেও দেখা যায় যে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল।একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন তাদের গুণে গৌরবান্বিত হতো।আজ চিত্রটা অন্য রকম।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। তারা তেমন ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী আর হয় না। পড়াশোনার বিষয়ে তাদের মধ্যে চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। করোনা অতিমারীকে একমাত্র কারণ ধরে নেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা এর কারণ হতে পারে।এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি একটা বিশেষ অবদান রাখে। কিন্তু মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি যে আবশ্যক তা ইতিহাস চর্চা করলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যৎ।তাদের আত্মবিশ্বাস এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়।কিন্তু আজকাল সেই সব ছাত্র ছাত্রী অমিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী হতে চায় না তারা।এটা যে কি ভয়ংকর সামাজিক অবক্ষয় তা আমরা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করতে পারছি।তথাকথিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা গঠন মূলক মেল বন্ধন হওয়ার প্রয়োজন যার দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব।এর অন্যথায় সম্ভব নয়।সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকের মধ্যে এই চেতনা আসা প্রয়োজন,নাহলে আমরা অতিমারীর চেয়েও একটা ভয়ানক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।এই ধ্বংস প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়েও বেশি কিছু, যা একটা জাতির ঐতিহ্যের সংকট ডেকে আনতে পারে।

ইন্টারনেটের কবলে বই

রাজ রায়
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

একটা মানুষের মধ্যে তিনটি প্রয়োজন থাকা বাঞ্ছনীয় যথা- খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষা। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য দরকার। আর বেঁচে থেকে বসবাস করার জন্য বাসস্থানের দরকার আর দরকার শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান অর্জন করা। যে জ্ঞান আমাদের জীবনে প্রবাহমান সমুদ্রের চলার পথে এক সেতু তৈরি করে। সেই জ্ঞান তৈরি হয় বই থেকে। সেই বই আজকে আধুনিক সভ্যতায় প্রায় ধুলো পড়ে গেছে। চলে এসেছে ইন্টারনেটের প্রাচুর্য, এসেছে স্মার্টফোন, অত্যাধুনিক গ্যাজেট, ল্যাপটপ ইত্যাদি। যা আজকের সমাজে তরুণ-তরুণী এবং পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এবং হারিয়ে যেতে বসেছে বই।

আগেকার যুগে মানুষ বই পড়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করত। কিন্তু এখন আর বইয়ের পাতা উল্টে দেখে না। কারণ স্মার্টফোনের যুগে ইন্টারনেটের সমস্ত তথ্য তারা পেয়ে যাচ্ছে, তাই বই আজকের দুনিয়ায় লুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু এই যে ইন্টারনেটে তারা সমস্ত তথ্য পাচ্ছে, এটা কি সম্পূর্ণটাই নির্ভুল? একথা কে বলতে পারে? তাই “বই ধরো, বই পড়ো” এই ব্যাপারটাই হয়ে উঠেছে এখন একটা চিন্তার বিষয়। তাই আমাদের বর্তমান সমাজে বইকে সংরক্ষণ করতে হলে ইন্টারনেটকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বিচক্ষতা ও ধৈর্য দিয়ে বই পড়তে হবে। সঠিক তথ্য পেতে গেলে বই পড়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তাই শেষে বলতেই হয়, “বই ধরো, বই পড়ো, ইন্টারনেট ছাড়ো”।

রুদ্রাক্ষের শিব না শিবের রুদ্রাক্ষ

রোহিত ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র (২০২১) বাংলাবিভাগ

রুদ্রাক্ষ সবাই আমরা দেখেছি কিন্তু কেউ কি জানার চেষ্টা করেছি কি ভাবে রুদ্রাক্ষ শব্দটি আসলো ?

আসুন আমরা খুঁজে দেখি রুদ্রাক্ষ আসলে কি ?

"বৈজ্ঞানিকভাবে, পবিত্র রুদ্রাক্ষ গাছটি 'Elaeocarpus ganitrus Roxb' নামে পরিচিত এবং এটি Tiliaceae পরিবারের অন্তর্গত, একটি প্রশস্ত মুকুট সহ একটি বিশাল চিরহরিৎ চওড়া পাতার গাছ। ভৌগোলিকভাবে এটি গ্রীষ্মমন্ডলীন অঞ্চল এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে এবং প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

এটির উচ্চতা প্রায় 15 থেকে 60 মিটার। এই গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সাত বছরের মধ্যে ফল বহন করে। এই ধরনের গাছ বেশিরভাগই নেপালে, হিমালয়ের ঢালে এবং ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার কিছু অংশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর ইংরেজি নাম Utrasum Bead Tree। ইন্দোনেশিয়ায় রুদ্রাক্ষ গাছকে গণিত্রি গাছ বা জেনিত্রি গাছ বলা হয়। রুদ্রাক্ষ গাছের প্রায় ৭০% ইন্দোনেশিয়ায়, ২৫% নেপালে এবং ৫% ভারতে পাওয়া যায়।

রুদ্রাক্ষের পুঁতি হল রুদ্রাক্ষ ফলের বীজ যা রুদ্রাক্ষ গাছে জন্মায়। এর পুঁতিগুলি সম্পূর্ণরূপে পাকার সময় নীল রঙের একটি বাইরের খোসা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, তাই এগুলিকে 'ব্লুবেরি' পুঁতিও বলা হয় এবং মধুর স্বাদযুক্ত এই ফল বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি কয়েক দিন জলে রাখা হয় এবং তারপর ফলটির খোসা ছাড়িয়ে রুদ্রাক্ষ দানাটি বের করা হয়।"

"সংস্কৃত থেকে এই "Rudraksha" কথাটি এসেছে।

এবার যদি আমরা একটু এই কথাটাকে ভাঙ্গি তাহলে দেখতে পাবো "Rudra"অর্থাৎ শিব এবং "Aksha" মানে চোখ। বিশ্বাস করা হয় রুদ্রাক্ষ ভগবান শিবের চোখের জলের থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

শিবপুরাণ মতে মনে করা হয় শিব জড় দেহে আটকে থাকা সমস্ত জীবের সুখের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর আত্মার মধ্যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এরপর যখন উনি চোখ খোলেন তখন ওনার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে মাটিতে পড়ে সেইখান থেকে রুদ্রাক্ষ গাছের জন্ম। মনে করা হয় আধ্যাত্মিক বিকাশে এই রুদ্রাক্ষ সাহায্য করে, এবং শিবের শক্তি এর মধ্যে নিহিত আছে। এবং এই শক্তির কারণ হল, এটি শিবের তৃতীয় নয়নের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এও বলা হয় সব থেকে শক্তিশালী এবং দুষ্প্রাপ্য রুদ্রাক্ষ হলো ২১ মুখী রুদ্রাক্ষ।"

"আবার এমনও কথিত আছে রাবণ শিবের কাছে অমরত্ব এবং ইচ্ছা পূরণের জন্য বর প্রার্থনা করলে শিব রাবনকে সাতাশ মুখী রুদ্রাক্ষ প্রদান করেছিলেন। এবং যখন রামের সঙ্গে রাবনের যুদ্ধ হয় এবং রাম রাবণকে বধ করে সেই সময় ওই রুদ্রাক্ষের ২৭ টি টুকরো পৃথিবীর মধ্যে ২৭টি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কেউ এই ২৭টি টুকরো দেখতে সক্ষম হয়নি কখনো এবং বলা হয় এই ২৭টি টুকরো ২৭টি নক্ষত্রের শক্তির পরিচায়ক।"

"আবার পবিত্র বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে রুদ্রাক্ষ আধ্যাত্মিক ধর্মীয় এবং বস্তুগত তাৎপর্য বহন করে, এই রুদ্রাক্ষ পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করে এবং মহাজাগতিক বিবর্তনের রহস্য নিজের মধ্যে ধারণ করে আছে।"

"আধুনিক বিজ্ঞান মতে সমগ্র মানবদেহ স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্যান্য অঙ্গগুলির সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল জৈব-ইলেকট্রিক সার্কিট হিসাবে কাজ করে। ক্রমাগত হৃদস্পন্দন, রক্ত সঞ্চালন এবং স্নায়ুতে সংবেদনশীল এবং মোটর ইমপালসের সঞ্চালন, পেশীগুলির সংকোচন এবং শিথিলকরণের কারণে শরীরে বৈদ্যুতিক আবেগ তৈরি হয়।

এই বৈদ্যুতিক আবেগগুলি জৈব-বিদ্যুৎ নামে পরিচিত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের শক্তির মাত্রার পার্থক্যের কারণে জৈব-বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়।

সাইকো-সোমাটিক স্ট্রেস এবং অসঙ্গতি এই জৈব-বিদ্যুৎ প্রবাহের পাশাপাশি সিস্টেমের স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে ভেঙে দেয় যার ফলে অস্বস্তিকর অনুভূতি, অসুস্থতা এবং অস্বাভাবিক মানসিকতা দেখা দেয়। জৈব-বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে এই রুদ্রাক্ষ, এবং ব্লাড প্রেসার কমাতেও সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে এতে কিছু রাসায়নিক উপাদান আছে যেমন- alkaloids, flavonoids, tannins, steroids, triterpenes, carbohydrates, cardiac glycosides. ইত্যাদি, এদের একসাথে বলা হয় Rudrakine। রুদ্রাক্ষজবালা উপনিষদ, রুদ্রহৃদয় উপনিষদ, রাম রহস্য উপনিষদ,বৃহজ্জবালা উপনিষদ,অক্ষমালিকা উপনিষদ এই সমস্ত উপনিষদে এবং বৈদিক গ্রন্থ খুঁজে দেখলে রুদ্রাক্ষ সম্মন্ধে আরো অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।"

শেষে একটই কথা বলার ওপরে এত তথ্য দেয়ার পরেও রুদ্রাক্ষ এবং শিব দুজনকে ছাড়া দুজন সত্যিই অসম্পূর্ণ ।

রবীন্দ্র কাব্যে জীবনদেবতার স্বরূপ

মৌ দাস মজুমদার
প্রাক্তন ছাত্রী (২০২২), বাংলাবিভাগ

(এক)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)কাব্য সাহিত্যের একজন অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি সাহিত্য সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।তবে পদ্মার বোটের ভাবুক রবীন্দ্রনাথ আর জমিদারির কাছারি বাড়ির বিষয়ভোগী জমিদার পুত্র রবীন্দ্রনাথ- যেন ব্যক্তির দুই পৃথক সত্তা। কবি মনস্তত্ত্বেও এই দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব। তার বাইরের আমি আর অন্তঃপুরবাসী আত্মার দিত্বরূপ কবিচিত্তের নির্মাণ। একদিকে নদীবক্ষের নিরালায় রামমোহন রায়ের বেদান্তগ্রন্থের পাঠ—অদ্বৈততত্ত্বের আকর্ষণ, অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মের রসলীলা—সুন্দর ও অনির্বচনীয় শোভায় সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারে উপস্থাপন—এ দু'য়ের দ্বন্দ্বই তাঁর অস্তিত্বসূচকবোধের তথা 'অন্তর্যামী' বা 'জীবনদেবতা'-র প্রসূতি-গৃহ।

"যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,
তবে তাই হোক।"[১]

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার কাঠামো নির্মিত হয়েছিল 'চিত্রা'য়। তার অবচেতনে জীবন উপলব্ধির ছায়াগুলো যা খন্ড ভাবে 'মানসী' 'সোনার তরী'র বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশিত তা যেন ধেয়ে চলেছিল পূর্ণতার সন্ধানে।

জীবনদেবতা তত্ত্ব রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকদের দ্বারা বহু আলোচিত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বহু ব্যাখ্যাত হয়ে মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব প্রযুক্ত ব্যাসকূটের মতো রবীন্দ্রকূট হয়ে আছে। জীবনদেবতা তত্ত্ব এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে সমালোচকদের মতভেদের অন্ত নেই, কেউ তাকে কবির সৌন্দর্যচেতনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ প্রেমচেতনার সঙ্গে তাঁকে অভিন্ন মনে করেছেন, কেউ সৃজনীশক্তিবাদের সঙ্গে জীবনদেবতাবাদের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন। কেউ বা বিশ্ব চৈতন্যবাদের মধ্যে জীবনদেবতার ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। কবি স্বয়ং জীবন দেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জীবনের নানা পর্বে নানা কথা বলেছেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে কবি জীবনদেবতা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন তা থেকে জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির নিজস্ব ধারণাটি তারই জবানীতে উপস্থিত করা চলে। কবি লিখেছেন :

"এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভালো-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। .....আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন। ... নিজের জীবনের মধ্যে এই-যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে, যে আবির্ভাব অতীতের মধ্যে, প্রাণের পালের উপর প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন ঘাটে ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম ।"[২]

অর্থাৎ কবির মধ্যে যে একটি সৃজনশক্তির বিকাশ হয়, যাকে মধ্যযুগের কবিরা দৈবীশক্তি বলতেন, আমরা বলি প্রতিভাশক্তি তার কথাই কবি প্রকারান্তরে বলেছেন তবে সেই শক্তিকে তিনি তাঁর সারাজীবন—ব্যক্তি জীবন ও কবি জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী কবির জীবনদেবতাকে ever evolving Personality - ক্রমশ উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব রূপে অভিহিত করেছেন। অজিত চক্রবর্তীর কথার অনুসরণে বলা চলে —কবির জীবনদেবতা তত্ত্ব তাঁর জীবনতত্ত্ব—কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন উভয়েরই উদ্বোধনী শক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কবি- জীবন ও ব্যক্তিজীবন এক এবং অভিন্ন।সেক্ষেত্রে বলা চলে জীবনদেবতাই কবির -

ক) জীবন তরণীর কর্ণধার,
খ) সোনার তরী-র "মেয়ে",
গ) মানসসুন্দরী,
ঘ) লীলাসঙ্গিনী

শুধু তাই নয় ইনিই কবির নিরুদ্দেশ যাত্রার রহস্যময়ী নারী, তাঁর জীবনের দেবতা, কবির ভাষায় - আমার প্রেয়সী/ আমার দেবতা /আমার বিশ্বরূপী। জীবনদেবতাই কবির কাব্যপ্রেয়সী, তাঁর জীবনের দেবতা, আবার তিনি তাঁর বিশ্বদেবতা।

(দুই)

জীবনদেবতা ধারণা বস্তুবাদী দর্শনে অচল।মানুষ যেন এক অদৃশ্য খেলোয়াড়ের হাতের পুতুল।পুতুলকে যেভাবে তৈরি করা হয়,পুতুল ঠিক তাই;পুতুলকে যেভাবে নাড়াচাড়া করা হয় ,সেভাবেই সে নড়েচড়ে।রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যেন তাঁর জীবননাট্যের পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার ব্যাখ্যা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করেছেন। এইপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

"নাটকের নির্দেশকের অভিনেতার সঙ্গে যেমন একটা প্রীতির সম্বন্ধ আছে,এবং তিনি তাঁকে কিভাবে কি অভিনয় করতে হবে শিখিয়ে দিচ্ছেন,যেমন অভিনেতা ঠিকমতো অভিনয় করেন কিনা তা দেখে তিনি সাফল্যে আনন্দ পাচ্ছেন, অসাফল্যে বেদনা পাচ্ছেন,ঠিক তেমনি জীবনদেবতা জীবননাট্যের অভিনয়েও আছেন, তার বাইরেও আছেন।তিনি ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়ে তার সহযোগিতা নিয়ে নিজের ইচ্ছাটি পূরণ করতে চাইছেন।"[৩]

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবনদেবতাকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনের কর্ণধার' বলে মনে করেছেন। এই জীবনদেবতা মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন একই সাথে তিনি জীবনের অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিল আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধি দিক আছে এক যাকে বলি আমি আর তার সঙ্গেই জড়িয়ে মিশিয়ে যা কিছু যেমন আমার সংসার আমার দেশ আমার ধন জনমান এই যা কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা চিন্তা কিন্তু পরম পুরুষ আছেন সেই সমস্ত কে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্ততাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে।"[৪]

'জীবনদেবতা' তত্ত্বটি একদিনে গড়ে ওঠেনি ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে একদিন হঠাৎ করে তার আত্মপ্রকাশ ঘটলো - এ বিষয়ে তিনি হিবার্ট বক্তৃতা মালায় এর উল্লেখ করেছেন।এই 'জীবনদেবতা' রূপী পরমসত্ত্বাটি ব্যক্তিরূপি ঈশ্বর হয়ে তার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন। ইনি জগতের সৃষ্টিকর্তা হল ভক্তদের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান। ভক্তের জীবন সার্থক হলেই তার নিজের সার্থকতা ।রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর ,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের কল্পনার এই হল সীমার মাঝে অসীমের লীলা। এখানে ঈশ্বর ও ভক্ত উভয় মিলে ভক্তের জীবনকে পরিস্ফুট করেছেন ।ভক্তের জীবনে কর্ম প্রবাহের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের সঙ্গে বাউলদের সাধন তত্ত্বের ভীষণ রকম মিল দেখা যায় বাউলরা পরমসত্তাকে ব্যক্তিতে ভূষিত করে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তার পূজা করে। বাউলরা তাকে 'নরনারায়ণ' বলে সম্বোধন করে। বাউলরা বিশ্বাস করতো তিনি অরূপ আকারে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আছেন। বাউলরা একে 'মনের মানুষ' বলেও অভিহিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্য' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা একই সত্তা, কিন্তু তাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পরমসত্তা দুটি স্তরে প্রকাশিত হয়।

একটি, বিশ্বের নিয়ামক শক্তিরূপে, একে তিনি সত্যের প্রকাশ বলে স্বীকার করেছেন। এখানে তার কাজ নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মতো।

অপরটির প্রকাশ আনন্দরূপে। এখানে তিনি মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেছেন, বিশ্বজগতে নানা সৌন্দর্য স্থাপন করে ভক্তকে বলেছেন তোমার প্রেম আমায় দাও, আমার প্রেম তোমায় দিচ্ছি। এখানে তিনি ব্যক্তি মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"... বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয়, এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার; কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত, এটুকু না জানলে আমাদের কোন কাজের ক্ষতিই হয় না।"[৬]

(তিন)

চিত্রা কাব্যেই জীবনদেবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট উক্তি লক্ষ করা যায়—এমনকি এই কাব্যের দুটি জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতার নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— 'জীবনদেবতা' ও "অন্তযানী"। শেষোক্ত কবিতাটি লেখার কদিন পরে ছিন্নপত্র-র একটি চিঠিতে কবি এই কবিতার অন্তরালবর্তী উপলব্ধির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। কিছুকাল পরে লেখা চিত্রা-র সূচনায় কবি আপনার অন্তর্নিহিত যে যুগ্ম সত্তার কথা বলেছেন, ছিন্নপত্র-তে সেই যুগ্মসত্তার একটিকে বলেছেন 'বাইরের আমি', অপাটিকে আমার 'অন্তঃপুরবাসী আত্মা' অর্থাৎ প্রথমটি কবির 'ছোটো আমি' ও দ্বিতীয়টি তাঁর

'বড়ো আমি'। এই বড়ো আমিই কবির জীবনদেবতা।

চিত্রা জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতায় কবি তাঁর নিজের জীবন বিকাশের মধ্যে এই জীবনদেবতার আবির্ভাবকে সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করেছেন। কবির নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি কোনও দার্শনিক রূপে নয়, মানবীকরণের মধ্যে দিয়ে কাব্যরসের সামগ্রী হয়ে উঠতে পেরেছে। জীবনের এক বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কাব্য প্রেরণা বশে বিশেষ একটি অনুভূতি-বিদ্যুতের ঝলকের মতো কবির চিত্তে আবির্ভূত হয়, কবি চিত্তের সেই অনুভূতিকে emotion-এর স্তর থেকে intellect-এর স্তরে এনে কবি যখন তার তত্ত্বব্যাখ্যা করেন তখন তার একটা যৌক্তিকতা হয়তো থাকে কিন্তু কবিতার রসোপলব্ধিতে সেই ব্যাখ্যা অনুভব কতদূর সহায়তা করে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বিষয়ক চিত্রা কাব্যের কবিতাগুলিকে আমরা নিছক তত্ত্ব বলে মেনে নিতে পারিনি, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচকগণ এমনকি স্বয়ং কবি এই কবিতাগুলির সেইরূপ তত্ত্বব্যাখ্যাতেই উৎসাহিত হয়েছেন দেখা যায়। জীবনদেবতা' কবিতাটি রচনার (২৯ মাঘ ১৩০১) মাসখানেক পরে (৬ই চৈত্র) কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমারকে লেখা এক চিঠিতে কবি লিখেছেন—

"জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল জীবন-দেবতা। আমার জীবনটিকে অবলম্বন করে যে অন্তর্যামী শক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলছেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করচি আমাকে আশ্রয় করে হে স্বামিন্ তুমি কি চরিতার্থতা লাভ করেছ? যা হতে চয়েছিলে যা করতে চেয়েছিলে, তা কি সব সম্পন্ন হয়েছে। আমার দ্বারা যা কিছু হওয়া সম্ভব সব যদি শেষ করে থাক, এখন যদি তোমার আঘাতে আমার এ বীণা আর না বেজে ওঠে, তোমার ইঙ্গিত মাত্রে আমার মনোঅশ্ব আর ছুটতে না পারে তবে এই জীর্ণতা অসারতা ভেঙে চুরে ফেলে আবার আমাকে নূতন রূপ নূতন প্রাণ দাও নূতন লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের অনাদিকালের চিরপুরাতন বিবাহবন্ধন নবীকৃত করে দাও।"[৭]

জন্মান্তরেও তিনি জীবন নিবেদন ব্রতে দীক্ষিত হতে চান। 'অন্তর্যামী' কবিতায় কবির বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহলের প্রকাশ লক্ষ করা গেলেও জীবনদেবতা' কবিতায় জীবনদেবতার ওপর প্রগাঢ় প্রত্যয়েরই প্রকাশ ঘটেছে। বররূপী জীবনদেবতার পদে বধূরূপী কবি-আত্মার পূর্ণ আত্মসমর্পণ এই কবিতার বৈশিষ্ট্য, কেবল কবির জিজ্ঞাস্য— এই সুনিশ্চিত আত্মসমর্পণ একান্ত ও তাঁর চালকশক্তির অভিপ্রায়ানুরূপ হয়েছে কিনা?

(চার)

রবীন্দ্রনাথের এই 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের সঙ্গে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের অনেক মিল পাওয়া যায়। এই তত্ত্বের দুটি রূপ আছে। একটি রূপ উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের মত একটি প্রচ্ছন্ন নৈব্যক্তিক সত্তাকে স্বীকার করে, অন্য রূপটি বৈষ্ণবদের দ্বৈতবাদের মতো ভগবান ও ভক্তের ব্যক্তিরূপে দুটি আলাদা সত্তা স্বীকার করে। ভগবান এক রূপে মানুষের প্রেম ভিক্ষা করে এবং অন্যরূপে বেদান্তের সকল বস্তুর ধারক সত্তা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।" [৮]

এ প্রসঙ্গে জীবনদেবতা তত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণব সাধন তত্ত্বের সাদৃশ্যের কথা বলা যেতে পারে। ভগবানের সঙ্গে চারটি রূপের কথা 'চৈতন্যচরিতামৃত'- এ বলা আছে। এই চারটি রূপ হল দাস্য,সখ্য,বাৎসল্য এবং শৃঙ্গার। শৃঙ্গারকে মধুর রস বলা হয়ে থাকে। দাস্য ভগবানকে প্রভু হিসেবে, সখ্যে বন্ধু হিসেবে, বাৎসল্যে পিতা-মাতা রূপে এবং শৃঙ্গারে ভগবানের সঙ্গে মানুষের প্রেম প্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মধুর রসের সাধনা বলতে শ্রীরাধার সাধনার কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—

"জীবনদেবতা তত্ত্বের সঙ্গে মধুর রসের সাধনার মিলও আছে আবার অমিলও আছে। মিল এই জন্য যে উভয় ক্ষেত্রেই প্রীতি পরিপূর্ণতম রূপে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু দুই তত্ত্বের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্যও আছে। রাধাভাবে সাধনায় ঠিক সাম্যের ভাব পাওয়া যায় না; তাঁর দয়িত যেন তাঁর থেকে বড়, এই ধরনের একটি চিন্তা বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র আছে। এখানে বলা হয়েছে রাজার রাজা হয়েও জীবনদেবতা ভক্তের প্রেমের ভিখারী। এই চিন্তায় সাম্যের বোধ অত্যন্ত প্রকট।" [৯]

পরমসত্তার স্পর্শ পাওয়াই হল মানব জীবনের পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে-বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে। ...কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে। বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে। এ কবি কথা নয়,এ বাক্যালঙ্কার নয়-আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠেছে। বাতাসে

যখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর করে খেলিয়ে ওঠে তখঞ্জ তাদের সেই আশ্চর্য মিলন এবং সৌন্দর্য আমাদের চোখ দেখতে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়। ...এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারিনে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে,কান দিয়ে,নাক দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে নানা দিক দিয়ে তাকে নানা রকম করে নিই।এই একতান মহা সঙ্গীতকে আমরা দেখি,শুনি, ছুঁই,শুঁকি আস্বাদন করি।" [১০]

এখানে তিনি যে মহা সঙ্গীতের সুর শুনতে পাচ্ছেন আসলে সেটা পরমসত্তার ডাক।এখানে সব মিলেমিশে পরমসত্তায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছেন তুমি ,আমি, কেউ নেই, আছে শুধু বীণা, এখানে তিনি বীণা বলতে পরম সত্তাকেই সূচিত করেছেন। তিনি একটি গানের মধ্যে দিয়ে বলেছেন-

"শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো....
হৃদয় আমার চায় যে দিতে,কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে,
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়।" [১১]

পরম সত্তাকে তিনি বন্ধু বলে আরাধনা করেছেন বন্ধু ক্ষণিক স্পর্শ দিয়ে অনন্ত পথ চলা কে সুন্দর করে তোলে। বন্ধুর নিবিড় আত্মীয়তা সহচর্য তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে,তাই তিনি পরমসত্তাকে বন্ধুরূপে কল্পনা করেছেন। বন্ধুর সঙ্গে হাতে হাত রেখে পথ চলতে চেয়েছেন।তিনি বলেছেন—

"বন্ধু রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে।।
বন্ধু বেলা বৃথা যায় রে,
আজি এ বাদলে আকুল হওয়ায় রে -
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে।" [১২]

আসলে, জীবন এবং মৃত্যুর সম্পর্ক বিপ্রতীপ নয়। বরং বলা যায়— জীবনের অভ্যন্তরে মৃত্যুর অস্তিত্ব থাকে প্রতিমুহূর্তে আর সেকারণেই বিশেষ মৃত্যুমুহূর্ত ব্যতীত মানুষের চেতনে মৃত্যুর আশঙ্কা বা পরিণতি সর্বক্ষণ আমাদের তর্জনী উঁচিয়ে ভয় দেখাতে পারে না। কবির কাছে জীবন-মৃত্যুর ঐক্যবোধেই তাঁর সত্তার অস্তিত্ব। প্রমাণিত, মৃত্যু ছাড়া জীবনের কোনো অস্তিত্ব নেই। এরা পরস্পর ওতপ্রোত। পৃথিবীর সংসারধর্মে, সুখ-দুঃখে জড়িত মানুষ তার জীবনের সম্যক উপলব্ধি করে, যখন মৃত্যুসম্পর্কে তার চেতনা হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা জীবিতকালে যিনি, মৃত্যুর সময়েও তিনি। মনের ভিতরে তার আবাস। আসলে এই মৃত্যু তো সমাপ্তি বা শেষ নয়, এই মৃত্যু হল এক অনন্তের প্রতি মহাবিশ্বের মহাপ্রাণের সাথে জীবনের সমষ্টিযোগ। শরীরের ছোট বৃত্ত অথবা পরিধিকে ভেঙে অখণ্ডে শাশ্বত জীবনে লীন হয়ে যাবার আশ্চর্য নীলাভ সময়।

প্রকৃতপক্ষে মাটি এবং মানুষের করুণ নিবিড় সম্পর্ক রবীন্দ্র নান্দনিকতায় হয়ে উঠেছে বড় বেশি উদার এবং উদাসীন। কবির অন্তরের 'sentiment of the sublime' বা 'বিরাট রস" প্রাধাণ্যের আধিক্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে পীড়িত র্দুভাবিত মানুষের সংস্পর্শ থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে আনে। যেন সেই বিশ্বদেবতার উপর সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব তিনি সহজ এবং সাবলীলভাবে ছেড়ে দেন। অন্তরের জীবনদেবতার প্রতি অনুসন্ধিৎসা বা euploration drive-ই হয়ে ওঠে জীবনের সাদা-কালো রূপের সমগ্রতায় মুগ্ধ কবির প্রতিপাদ্য বিষয়।

তথ্যপঞ্জী:

১. রবীন্দ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ন-১৩৯৩, চিত্রা (অন্তর্যামী- ভাদ্র, ১৩০১) পৃষ্ঠা- ১৬২

২. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ২৭

৩. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৫৭

৪. মানব সত্য, মানুষের ধর্ম, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৬৫৮

৫. গীতাঞ্জলি ১২১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৮১

৬. সৌন্দর্য, শান্তিনিকেতন গ্রন্থ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী,পৃষ্ঠা- ৫৬৯

৭. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫, পত্র- ২

৮. গীতাঞ্জলি ১২১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৮১

৯. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৫০

১০. শোনা, শান্তিনিকেতন গ্রন্থ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৫৪৫-৪৬

১১.গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ৭৭

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০১

THE PAST FORM

Susmita Adhikary

It was the last weekend,
we were giving English exam.
who want to give ?
This exam should be damned!
however it went handy,
As I had used Plan-D.
But for my friend, Liza
there was the most hard question.
Which was the past form of "think",
was giving her a lot of tension.

She was telling me,
"I thought and thought
and tried a lot to find,
But even after tryin' a lot
Yet it didn't came in my mind!"

SHOE

Susmita Adhikary

From the school
untill the grounds.
Hanging out with friends,
passing over the drains.
We walk,
We walk by our own feet.
Sometimes on the road or on the street.
But of that person, people don't care.
Who always stay with them,
aren't they fair ?
Give a look at them,
how kind they're.
They never complain to you,
even when you don't care.
When it get very old,
everyone throws them away.
Remember those old memories,
Which your shoes can say.

MAGIC

Shamindra Chattopadhyay

English honours, 4th semester

Magic everywhere makes this dumb me
Wonder and more aware.
Where have we come from,
Back where do souls go?
How's the sky limitless,
What makes the firefly glow?

Who is behind all these,
Where resides the magician?
Whose comrnand guides the nature
To undergo constant transformation?

Does she know witchcraft
Or some hidden art?
Or else what elixir could turn dead earth
Into the most sophisticated art?

Wonder is the way of living,
Magic everywhere.
A millennium would fall short
To find how why and where.

The more I look around
The more I wonder.
This path of mystery
Leads me inward.

Some say God is bliss,
Some say alimighty.
No one recognizes cosmic intelligence
As the true form of divinity.

কে ছিল ওটা?

শ্রেয়সী রায়
প্রথম সেমিস্টার

কিরে পড়তে যাবি না আজ?

বাইরে থেকে প্রীতির ডাক পড়লো

—হ্যাঁ যাবো তো আসছি, তোরা চলে এসেছিস?

ঘর থেকে সারা আসলো তানিয়ার।

ঘটনাটা ২০১৯ এর নভেম্বর। এর সদ্য ঠান্ডা পড়েছে, গায়ে গরম জামা না জড়ালেও চলে। প্রত্যেক শুক্রবারের মতো পড়তে যাচ্ছিল চারটি মেয়ে, তবে টিচার সেদিন বাড়ি নেই তাই ছাত্রীদের মধ্যে একজনের আত্মীয় হওয়ায় তার বাড়িতেই চাবি রেখে গেছেন,বরাবরই এরকম হয়ে থাকে, চারটি মেয়ে পড়তে গেলো বিকাল সাড়ে পাঁচটা ,পড়ার এক ঘন্টা আগেই।ক্লাস নাইনে পড়া দস্যি মেয়ে, হুড়োহুড়ি খেলাধুলা পছন্দ করে। সন্ধ্যা নেমেছে, ফাঁকা বাড়ি কিন্তু লোক নেই,খেলাটা আজ জমবে ভালো। বকা দেওয়ার মতো আজ কেউ নেই, ঘন্টা খানেকের মধ্যে ফিরবে বলে মনে হয় না। মেয়ে গুলি ঘরে ঢুকে ব্যাগগুলো এক কোণায় রেখে খেলা শুরু করলো। কে চোর যাবে গোনা শুরু হলো দশ, কুড়ি, ত্রিশ..., চোর হলো অঙ্কিতা, যথারীতি খেলা চলছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেলো হাসি ঠাট্টা আর খেলাতে।

অঙ্কিতা এবার, আবার চোর হলো, বাকি তিন জন ছাদে উপর একটি চৌকির পেছনে লুকালো। অনেকক্ষণ পর অঙ্কিতা ঠিক ধরে ফেললো সবাইকে। চৌকির পেছনে লুকিয়ে হাতে, পায়ে ধুলো লাগলো বাজে ভাবে,

এবার একে একে সবাই নিচে নেমে আসলো, ডাইনিং রুম , রান্না ঘর ছেড়ে তারপর বাথরুম, চার জনেই হাত ধুতে বাথরুমে ঢুকলো, অঙ্কিতা আর বর্ষা হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে গেল। তানিয়া আর প্রীতি পড়ে রইলো বাথরুমে।

কিছু সময় পর হাত পা ধুয়ে, তানিয়া আর প্রীতি বেরালো। বাথরুম এর লাইট অফ করলে, রান্নাঘর প্রায় জায়গায় অন্ধকার হয়ে থাকে, আবছা দেখা যায়। তারপর ডাইনিং রুম আর তার মাঝখানে দেয়াল তারপর ছোট বাইরের বারান্দা। তানিয়া বাথরুম এর লাইট অফ করে দিলো। বাথরুম থেকে বেরিয়েই রান্নাঘর।

হঠাৎ প্রীতি আর তানিয়া দুজনেই দেখলো রান্না ঘরের মিটকেসের পাশের জায়গায় কেউ একজন বসে আছে হাঁটুতে মাথা গুজে আর ফিক ফিক করে হাসছে। তাকে অবিকল বর্ষার মতো লাগছে। একই জামা পরা যেটা বর্ষা পরেছিল। তানিয়া আর প্রীতি দুজনেই যেহেতু ভীতু, তাই দুজনের মজা ওড়াতে বর্ষা প্রায়শই এরকম মজা করে থাকে। তাই দুজন হঠাৎ ওই ছায়া মূর্তি দেখে ভয় তে “বর্ষা কে ভূতে ধরেছে, বর্ষা কে ভূতে ধরেছে” এই বলতে বলতে হাসতে হাসতে ডাইনিং রুম ক্রস করে বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় চলে গেলো।

কিন্তু সেখানেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা রহস্য, বারান্দায় গিয়ে দুজনের মুখই শুকিয়ে গেলো, তারা নিজেদের চোখ কে বিশ্বাস করতেই পারছে না যে তারা কি দেখছে, বা যেটা তারা দেখছে সেটা সত্যি কিনা, দুজন দুজনের মুখের দিকে ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

তারা বারান্দায় এসে দেখলো অঙ্কিতা আর বর্ষা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ।রহস্য দানা বাঁধছে দুজনের মনে। তারা সব কিছু গুলিয়ে ফেলছে । তাদের এই অবস্থা দেখে বর্ষা জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে তোদের?

তারা কয়েকটা ঢোক গিলে সব বললো তাদের, বর্ষা তো হেসেই কুটোকুটি, সে বিশ্বাস ই করছে না দুজনকে।

আর তারা নিজদের চোখ কে। সেসব আজও রহস্য। মনে পড়লে গায়ে কাটা দেয়, রাতে ঘুম হয়না।

রহস্যটা কুড়ে কুড়ে খায়

সেদিন বাড়িতে তো আমরাই চার জন ছিলাম, বর্ষা -অঙ্কিতা যদি বাইরে থাকে।

রান্না ঘরে কে ছিল ওটা?

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

নেতাজী

আয়ুষ ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র (২০২১), বাংলাবিভাগ

কটক শহর আলো করে জন্ম নিলে তুমি,
তোমার গর্বে গর্বিত মোদের মাতৃভূমি।
ক্ষুদিরামের ফাঁসির খবরে কেঁদেছে তোমার হৃদয়,
দেশবাসীকে দিয়েছো তুমি দেশ স্বাধীনের অভয় ।
দেশ বিজয়ে ছিলো পাশে তোমার বন্ধু রাসবিহারী,
সাবমেরিনে দিয়েছো তুমি জার্মানিতে পাড়ি।
দেশের স্বার্থে রেখেছো তুমি নিজের জীবন বাজী,
সবার হৃদয় জুড়ে আছো তুমি মোদের নেতাজি।।

প্রাণের বাংলা

রাজ রায়
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা আমার প্রাণ
তাইতো আমি মনে প্রাণে
বাংলাকে করি সম্মান।
বাংলা আছে শিরায় শিরায়
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
হৃদয়ে ভরা ভালোবাসা
বাংলা ভাষার সাথে।
বাংলায় আছে বিশ্বকবি
বিশ্বজোড়া এক সে রবি।
অ, আ, ক, খ হাতে খড়ি বর্ণ পরিচয়
তারপর হয় বাংলা গদ্য পদ্যের পরিচয়।
বাংলা আমার গর্ব
বাঙালি আমি বিশ্বজুড়ে
বাংলাকে তুলে ধরবো।

স্বাধীনতা

আয়ুষ ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্র (২০২১), বাংলাবিভাগ

চলো সবে দেশবাসী শক্ত করো মন,
করবো মোরা আজি ওই গোরাদের পতন।
স্বাধীনতার দাবিতে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিল ক্ষুদিরাম ,
চালিয়ে যাবো মোরা এই আন্দোলন অবিরাম।
ধানের বদলে করেছে জোর যারা করতে নীল চাষ,
তারাই করেছে এই দেশেতে প্রায় দুশো বছর বাস।
মানবোনাকো আর মোরা ব্রিটিশ পরাধীনতা,
চাই মোদের আপন দেশের আপন স্বাধীনতা।।
জয় হিন্দ বন্দেমাতরম।

“পরিপূরক আমরা সবাই”

সংহিতা দেবনাথ
প্রাক্তন ছাত্রী (২০২১), খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ

পৃথিবীর এই রঙ্গ মঞ্চে
পরে নিজের সাজ;
যে যেখানে আছ সবাই
করছ আপন কাজ।
সবার তরে সবাই আমারা
কেউ নয় কারো পর;
যে বা যেমন কর্ম করে
চালায় নিজের ঘর।
কেউ বা মাঠে করছে যে চাষ
কেউ বা মজুর জন;
কেউ বা কবি লিখছে কাব্য
একলা প্রতিক্ষণ।
কেউ বা আপিসে কলম
চালায়
কেউ বা যে বস তার;
কেউ বা হয়ত কলের মালিক
করে কর্ম যার।
পরিপূরক আমরা সবে
সবার সুখে সুখ;
পাশাপাশি করছি যে বাস
সবার দুঃখেই দুখ।

ঋতুরাজ বসন্ত

রিমি দাস
প্রাক্তন ছাত্রী (২০১৭-২০২০), বাংলাবিভাগ

বসন্ত যে এসেছে দ্বারে,
প্রকৃতি তারে নিল বরে।
গাছে গাছে ভাসে ফুলের কলি,
তারই লোভে ধায় অলি,
মিষ্টি সুরে কোকিলের গান,
যা শুনে সকলের জুড়ায় প্রাণ,
শিমুল-পলাশ ডালে ডালে,
মাথা দোলায় হাওয়ার তালে।
রক্তেরাঙা কৃষ্ণচূড়ার বন,
হারিয়ে যেতে কেবলই চায় মন।
শান্ত আকাশে, হালকা বাতাসে,
কেবলই কচি পাতারা হসে,
স্নিগ্ধ রোদ ঝলমলে দিনে,
চেয়ে থাকি প্রকৃতির পানে।
প্রকৃতির এমনরূপ কেবলই মেলে,
এই ঋতুরাজ বসন্ত এলে।

যান্ত্রিকতার বাইরে

রিমি দাস
প্রাক্তন ছাত্রী (২০১৭-২০২০), বাংলাবিভাগ

ইচ্ছে হয়,
এই যান্ত্রিকতার নগর ছেড়ে,
ছুটে যাই, ওই গহন অরণ্যের ভিড়ে।
প্রকৃতি যেখানে জাগে ভোরের স্নিগ্ধ পরশে
ফুলের সুবাস বইতে থাকে মৃদুমন্দ বাতাসে।
কচিপাতা ভরে যায় গাছের শাখায় শাখায়,
হাওয়ার তালে দুলতে থাকে মনের উন্মাদনায়।
দিকদিগন্তে ছেয়ে যায় নানা রঙের মেলা,
তারই সঙ্গে মেতে উঠে, ফুলেরা করে খেলা।
অবিরত চলতে থাকে পাখিদের কলরব,
দূর করে দেয় যেন মনের ক্লান্তি সব।
পশুপাখি, নদীনালা- সবই তাদের চেনা,
আপন খেয়ালে চলে নদী কেউ করে না মানা।
গাছগুলি দাঁড়িয়ে সব বাহারি ফুলে ভরে,
বনের মাঝে পশুগুলি থাকে সবুজ চাদর মুড়ে।
নদীর তীরে বাঁধা—কয়েকখানি তরী,
ঢেউগুলি তার আশেপাশে করে ঘোরাঘুরি।
পাহাড়-নদী-গাছপালা সব থাকে মিলেমিশে,
এমন সুযোগ নেই যে কোনো যান্ত্রিকতার দেশে।

সবুজ ঘাসের মাঠের পাশে

রুমা পাল
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

সোনালী দীঘির ধারে-
ছোট্ট মোদের বাড়ি খানায়,
খুশির হাসি ঝরে!

সেই উঠোনে আমের আঁচার
সোনালী রোদের পরে।
পেয়ারা গাছের মগডালেতে
কোকিল গায় গান;
মিষ্টি সুরের কুহু কুহু
জুড়িয়ে যায় প্রাণ।
বাতাবি লেবুর ফুলগুলি সব
দুলছে হাওয়ার টানে,
তার সুগন্ধে মনটা যেন
খুশির নাচন নাচে।
ভরদুপুরে কোথা থেকে
আওয়াজ আসে ভেসে-
পাখিদের ওই কলকাকলি,
একটু থেমে থেমে।
সন্ধ্যে বেলায় শাঁখের ধ্বনি,
তুলসী তলায় প্রদীপ
ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ ডাক-
গাইল যেন গীত।
জোনাকি সব উঠলো জ্বলে
ছড়িয়ে দিয়ে আলো;
নতুন ভোর আসবে আবার
শেষ হবে সব কালো।

বাংলা আমার মাতৃভাষা

জলি মিত্র
প্রাক্তন ছাত্রী (২০২০), বাংলাবিভাগ

বাংলা ভাষা   বড়োই খাসা
বিশ্ব মাঝে সেরা,
মায়ের মায়া শীতল ছায়া
শহিদ স্মৃতি ঘেরা।
ভাষার তরে লড়াই করে
প্রাণটি দিলো যারা,
তাঁদের স্মৃতি অমর গীতি
শাশ্বত যে তাঁরা।
কূটকৌশলে বাংলার স্থলে
উর্দু কায়েম করতে,
ছাড়লো পাকে বুলেট ঝাঁকে
ফলে হলো মরতে।
মায়ের ভাষা ভালোবাসা
দামী প্রাণের চেয়ে,
রাখতে মানে প্রাণটা দানে
বুলেট বুকে খেয়ে।
আত্মদানে   বাংলা আনে
পেলাম মাতৃ ভাষা,
জীবন পণে দৃঢ়তা সনে
যুঝবো রাখছি আশা।

"গলদে বাংলা ভাষা"

জলি মিত্র
প্রাক্তন ছাত্রী (২০২০), বাংলাবিভাগ

নামে বিদ্যালয় স্কুল, ঘণ্টা হলো বেল,
পণ্ডিত মশাই স্যার, বেচাকেনা সেল,
প্রাতরাশ ব্রেকফাস্ট, মিল দুপুরের,
বিকেলে টিফিন চলে, ডিনার রাতের।
ড্যাডি সম্বোধনে বাবা, মাকে মাম্মি ডাক,
বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ডস, আধা হলো হাফ,
অনুষ্ঠান পর্ব পার্টি, দরদ সিম্পাথি,
খেলোয়াড়কে প্লেয়ার, পার্টনার সাথী।
কর্মচারী জব করে, শুন্য স্থানে জিরো,
শিল্পী মহল আর্টিস্ট, নায়ক যে হিরো,
দুঃখ প্রকাশ সরিতে, বাহবা থ্যাঙ্কিউ,
প্রেমের পাত্র লাভার, মূল্যায়নে ভিউ।
জন্মমৃত্যু ডেথ বার্থ, অনুষ্ঠান পার্টি,
হ্যাপি বার্থডেতে, জন্মদিন খাঁটি,
প্রদর্শনী শো চ্যাপ্টার,বেড়ানোটা ট্যুর,
লিভ্ টোগেদার বিয়ে, পরকীয়া সুর।
বাংলার নাম বেঙ্গল, রাজ্য হলো স্টেট,
রাজ্যপাল গভর্নর, জাল সাজে নেট,
সংস্কৃতি বিলেতি রূপে, হলো কালচার,
গুড মর্নিং সুপ্রভাত, ফর্দ ভাউচার।
ভালো মন্দ গুড ব্যাড, মিথ্যুক লায়ার,
আপ ডাউনে বোঝায়, উঁচু নিচু ভার,
মন্ত্রী সাজে মিনিষ্টার, লাল বাতি জ্বেলে,
ইংরেজ চলে গেলেও, ভাষা গেছে ফেলে।

PIKU: MOTION SE HI EMOTION

Writadhi Chattopadhyay

(Ex Student 2023) English Department

In 2015, there came a Hindi comedy drama movie Piku, starring Amitabh Bachchan, Deepika Padukone and Late. Irrfan Khan. It is no regular, spicy entertainment with a lot of action scenes, sizzling romance or flashy item songs. Written by Juhi Chaturvedi and directed by Shoojit Sircar, this movie aptly encapsulates the mundaneness of the day-to-day life of any middle class family, and showcases the unrefined and covert sides of our lives in the exact possible manner, articulately bringing up the issues which people seldom talk about. This movie is simple, and doesn't represent any fancy, dream-like world as it deals with the theme of ordinariness, however, it is sure to tug at the viewers' hearts and make them feel content. There is a sense of relatability which is sure to soothe the audience's minds and melt their hearts away.

The story of this movie primarily revolves around Bhashkor Bannerjee (Amitabh Bachchan), a seventy year old hypochondriac Bengali old man, settled in Delhi, who is always bothered by his irregular bowel movements, and his middle aged daughter, the titular character, Piku Bannerjee (Deepika Padukone),probably a tricenarian, an independent, extremely responsible, yet a grumpy woman, who has a mind of her own. She's in an exasperated mood, most of the time, as she is constantly perturbed by the eccentricities of her attention seeking old father, not more reasonable than a child. Piku's mother has died long ago and thus, she's the one who looks after her ageing father along with the assistance of their helping hand, Budhan. Piku, loves her father dearly, cares for him in every possible way, sacrifices all that she can, but doesn't show her affection outwardly. Bhashkor, on the other hand, can be reckoned to be a selfish person, who is unwilling to marry his daughter off so that she can take care of him. He is insecure, irritable, obstinate and sceptical. The Bannerjee family has an ancestral house in Kolkata, which Piku considers to be a "Jonjaal" (rubbish) and is eager to sell off. Bhashkor, on the other hand opposes her opinion and yearns for his native place, Kolkata. The father daughter duo, after a long altercation about the means of transport, finally agree to commute by car to Kolkata, along with Rana Chaudhary (Late. Irrfan Khan), the owner of a taxi business, from whom Piku rents cabs for her daily fares.

They embark on the journey, and after a series of hullabaloo, fussiness and chaos by Bhashkor, finally make it to their destination. Once in her native place, Piku eventually changes her mind about selling the property. Also, we see, Rana slightly hinting at Piku, not to sell the property. We find a sense of nostalgia growing in Piku. Again, as Rana and Piku spend quite some time together, in Kolkata, they grow pretty close, and develop a liking for each other. We witness the subtlest hint of romance, being portrayed in an extremely muted and modest fashion. Finally, Rana takes their leave, advising Bhashkor to stop his quirky activities. Bhashkor, not paying much heed to his words, cycles through the city, the next day, eats street side food to his heart's content, and returns home, gratified, after worrying off his family members a lot. He, for his extremely irresponsible behaviour is rebuked by his daughter, however he's appeased, inside and out, as his constipation has finally cleared out. The story unfolds to reveal more, to know which this movie has to be watched. The characters of Rana Chaudhary, Syed Afroz (Jisshu Sengupta), Piku's friend and co worker, Chhobi Mashi (Moushumi Chatterjee), Piku's maternal aunt and Dr. Srivastava (Raghuvir Yadav), their family doctor, are of great weightage as well. All of them are the well wishers of Bhashkor and Piku, and are closely knitted with their lives.

The cast played the roles in the most natural manner, making the movie look like an excerpt from the real life, and not any scripted enactment. The actors beautifully blended with their respective characters. Speaking of Bachchan and Padukone, they emitted the aura of authentic 'Bangaliana' even after belonging from completely non–Bengali backgrounds. Their dialogues, with occasional Bengali words and phrases made the movie seem cohesive with its storyline. Even, the subtle nuances, like, writing the spelling of "Bhashkor" with an "o" and not an "a" reflects the tendency of Bengalis to emphasize the "o" sound in their language. Again, we find, Piku getting annoyed with Aniket (Akash

Oberoi) for not knowing about the films of Satyajit Ray. And finally, we see the father-daughter duo, humming the tune of " Ei poth jodi na sesh hoy" during their car fare. There's also a feminist aspect to the movie, as Piku is portrayed to be an independent woman in every possible way, financially, sexually and ideologically. She's not a people pleaser and is the master of her own. When she felt like, she simply took a break from her work, just by verbally intimating Syed about her leave. Also, she didn't care to pick up Syed's call when she didn't feel like. Then, there's Bhashkor's ideology about marriage, stating that marriage without purpose is meaningless and that women are created for greater reasons than just simply gratifying their husband's needs. The settings of the movie, i.e., the houses portrayed in Delhi and Kolkata, emit a "proper middle-class, educated Bengali family" type essence. Also, the costumes and makeup of the cast is apt to portray the lingering simplicity and naturalness of the movie. Speaking of the direction, Sircar did an outstanding performance, in making the movie come to life, each and every single detail is intricate and adds to the realistic portrayal. Apart from the direction, what deserves accolades is the soulful music by Anupam Ray, which is congruous with the theme and setting of the movie.

To sum up, it is to be said that, Piku is an out-of-the-box kind of a movie that is sure to tingle the emotions of its viewers. Unlike most conventional, contemporary spicy movies, it is sure to make its audience introspect. It is slightly preachy, with a meaningful message to it, that is to not judge our ageing parents, and care for them no matter what; it also represents the value of independence of women. Piku is the perfect movie to be watched with the entire family. It not only satisfies the eyes but also appeases the heart. The love-hate relationship of this quirky father daughter duo is sure to trigger multiple emotions of the audience. Released almost 10 years ago, it continues to be relevant, in even today's context, and never gets anachronistic. For those, who didn't watch this movie, it's a great option to spend a lazy noon. This movie is apt for anyone from any age group.

বাংলা ছোটগল্প: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কাল ও উত্তরকাল

রাইমা চন্দ
প্রাক্তনছাত্রী, বাংলা বিভাগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ভয়াবহ যুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ এই ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ধরা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারত তথা বাংলাদেশেও প্রবলভাবে আঘাত করে,করে ভাঙচুর! বাংলাসাহিত্যে তাই এই যুদ্ধের প্রভাব যেমন ব্যাপক, প্রতক্ষ, তেমনি ভয়াবহ। এ এক সন্ধিক্ষণের সংকট। বাংলা ছোটগল্প ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল ও ছোটগল্পের যাত্রাপথ লক্ষনীয় মোড় ফেরানোর স্তর।

প্রকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়াল মন্বন্তর, বিদেশি শাসক ও শোষক শ্রেণীর চরম শাসনব্যবস্থা, আর এর দ্বারাই সীমান্তে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের পদসঞ্চার ঘটনা! বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মধ্যবিত্ত মানুষ ও সংসারে ভাঙন, অবক্ষয়, পচন, পতন, মেয়েদের চাকরি করতে বেরিয়ে আসার সুযোগে গণিকাবৃত্তির আর্বিভাব এই সব অস্বাভাবিকভাবে জনজীবনে চাপ সৃষ্টি হয়।

এই সব পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একে একে লক্ষণীয় বিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়। যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই সে সময়ের তরুণ লেখক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ দেখা দেন। আরও দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ। যুদ্ধ শুরুর পরে পরেই দেখা দেন আবার সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ। যুদ্ধের অসামান্য প্রতিক্রিয়া ও করুণ স্পর্শকাতরতার ছবি দেখা যায় রমাপদ চৌধুরির 'ভারতবর্ষ' গল্পে। সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' গল্পও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গভীর সমাজ রূপের অনন্য দলিল যেন! তারপর আরও দেখা যায় 'ফসিল' গল্প যেন সুবিশাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই বৃহৎ এক চিত্র। 'সুন্দরম','অযান্ত্রিক' এসব গল্পে সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র ও স্বভাবকে অভিনবত্ব দিয়েছেন।

সময় অস্থির, সমাজও দ্রুত বদলায়। আর এই সমাজ ও বিক্ষিপ্ত অনিশ্চয়তায় সময় যত স্পষ্ট হবে গল্পের চেহারাও বদল হবে। ছোটগল্প এমন এক শিল্প মাধ্যম, যার বদল দ্রুত। জীবনের ছোট-বড়ো খন্ড খন্ড মুহূর্তই একমাত্র বিষয় ভরসা, সমাজ-বাস্তবতাই যার একমাত্র মূলধন।

আমার কলেজ জীবন

রুমা পাল
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

আমি রুমা পাল, ২০১১ সালে আমি শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স নিয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হই।

প্রথম বার যখন কলেজে আসি তখন একটু ভয় ভয় লাগতো, মনে হতো এখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো কিনা।

আমার আজও মনে আছে যে, প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসটি আমি ধরতে পারিনি কারণ দেরিতে কলেজে এসেছিলাম। দ্বিতীয় ক্লাসে পিয়ালী ম্যাডাম এসেছিলেন। প্রথমবার ওনার কথা শুনে আমার একটু ভয় লেগেছিল, মনে হয়েছিল খুবই রাগী একজন ম্যাডাম। এরপর একে একে পরিচয় হলো সারদা ম্যাম, সুস্মিতা ম্যাম, প্রসেনজিৎ স্যার, রঞ্জিত স্যার প্রমুখ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে। ওনারা খুব যত্ন করে আমাদের পঠন-পাঠন করাতেন।

অন্যদিকে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও দায়িত্ববান একজন মানুষ যিনি ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন।

প্রথম দিকে পিয়ালি ম্যাডাম কে ভয় ভয় লাগলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম এনার এই বকাঝকার মধ্যেই একটি আলাদা স্নেহ লুকিয়ে আছে। এভাবে মনে মনে অন্য স্যার ম্যাডামদের সাথে সাথে পিয়ালি ম্যাডামকে আন্তরিকভাবে ভালো বাসতে শুরু করলাম। বেশ কিছুদিন যাবার পর বুঝতে পারলাম পিয়ালি ম্যাডাম প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে সন্তান স্নেহে ভালোবাসেন, ওনার মধ্যে আছে একটি মাতৃত্বময় মন।

আমার কলেজ জীবনের মাঝামাঝি সময়ে এসে একসময় আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে,এটা একটা কলেজ তার বদলে মনে হতো আমি একটা পরিবারের মধ্যে আছি, যেখানে বাবা-মা ও দিদি দাদাদের মতো শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ভাইবোনের মতো সহপাঠীরা আছে।

এই কলেজ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলাম। শুধু পড়াশোনা নয় তার সাথে শিখেছিলাম বাহ্যিক অনেক আচার আচরণ যা আমাদের পরবর্তী জীবনে এনে দিয়েছিল এক আলাদা মাত্রা। আমাদের ব্যাচের অনেকেই আলাদা করে বাইরে টিউশন পড়তো না, কলেজ থেকেই যত্ন করে যেভাবে ম্যাডামরা আমাদের পড়াতেন তাতে আলাদা করে এসবের প্রয়োজন ছিলো না।

আমরা বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক ভাবে পিছিয়ে ছিলাম তাই আমাদের কলেজ ইউনিয়নের দাদারা প্রত্যেক বছর ফর্ম ফিলাপের সময় আমাদের Concession করে দিত। তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার আগে আমাদের বেশ কয়েকজনের টাকার অভাবে ফর্ম ফিলাপে অসুবিধা হচ্ছিল সেই সময় আমাদের ফর্ম ফিলাপের পুরো টাকাটাই পিয়ালী ম্যাডাম দিয়ে ছিলেন। তারজন্য আমি ম্যাডামের কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

কলেজের সব কথা বলতে গেলে আমার লেখা হয়তো শেষ হবেনা তাই এখানে যতটা পারলাম কম করে বলার চেষ্টা করলাম। এই কলেজ থেকে অনেক কিছুই পেয়েছি। সবার আন্তরিকতায় আমরা ছিলাম আপ্লুত। আর এখানে এসেই আমি আমার মা'কে পেয়েছিলাম, তিনি হলেন আমাদের পিয়ালী ম্যাডাম। এখন হয়তো কলেজে সেভাবে যাওয়া হয়না কিন্তু কলেজ জীবনের তিনটি বছর আমার মনের মণিকোঠায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আর আমার প্রিয় পিয়ালী ম্যাডাম সারা জীবন আমার মা হয়েই থাকবেন।

PAINTING OF WILLIAM SHAKESPEARE

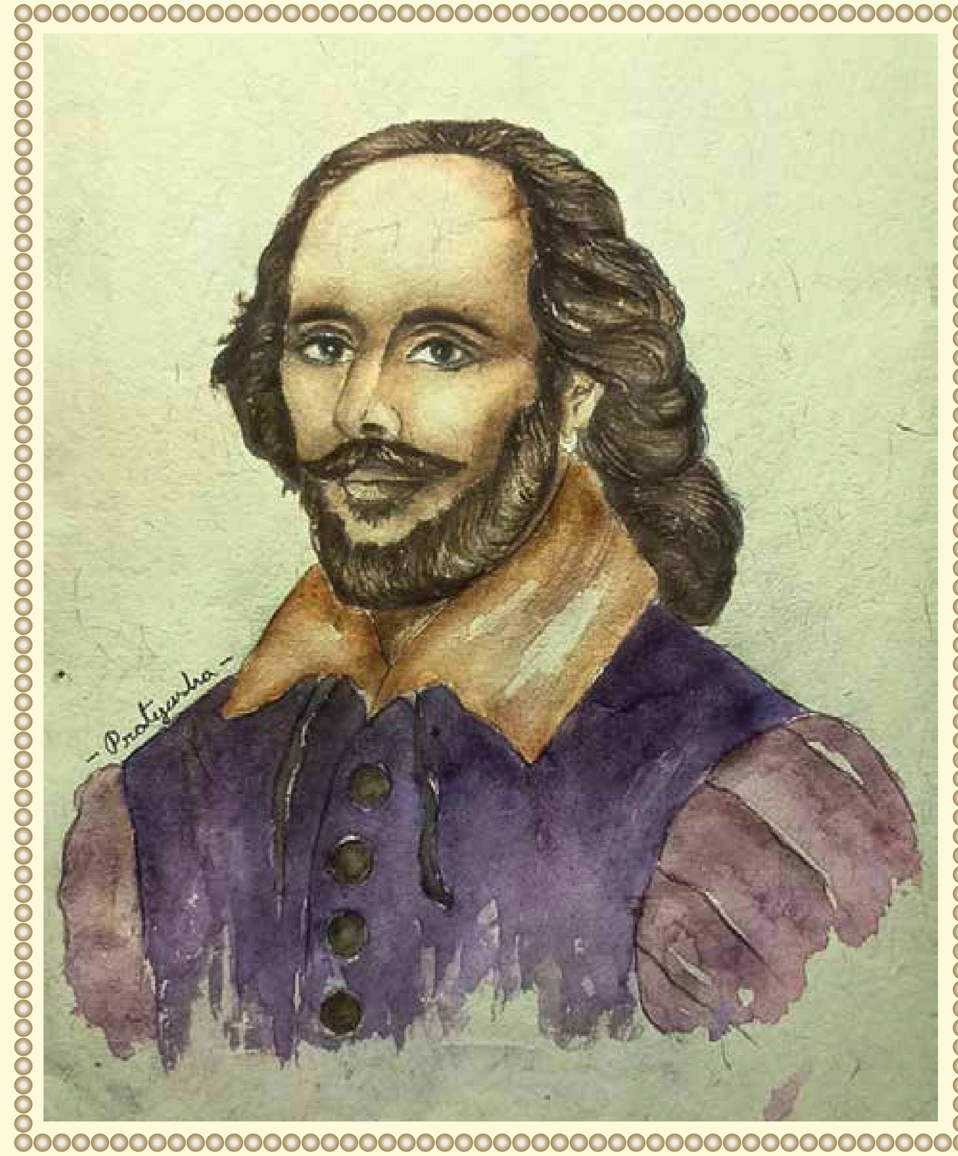

Pratyusha Sarkar
Semester VI
English Department